# দ্বিতীয় অধ্যায়

# প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প ঃ পর্ব বিভাগ ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিচিত্র সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে আমাদের আলোচনার বিষয় তাঁর ছোটগল্পগুলি। চল্লিশের দশক থেকে যে প্রেমেন্দ্র হয়ে উঠবেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অগ্রপথিক । তাঁর সমকালে এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার — তাঁর আবির্ভাব ছোটগল্পে আকস্মিক না হলেও চমকপ্রদ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য চর্চার সূচনা অবশ্য স্কুলে পড়ার সময় কবিতা লিখে। এ প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' বইটিতে। তিনি লিখেছেন যে সাউথ সুবার্বণ স্কুলে সংস্কৃতের পন্ডিতমশাই রণেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'বাংলা রচনা ক্লাসে অনায়াসে চিহ্নিত' করেছিলেন তাঁকে ও প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। স্কুলের খাতায় প্রেমেন্দ্রের লেখা 'হিমালয়' সংক্রান্ত একটি কবিতা দেখে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তিনি। আর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সাউথ সুবার্বন স্কুলে যাওয়া আসার পথে প্রেমেন্দ্র যে বস্তিজীবন দেখেছিলেন তাই ভাষারূপ পেয়েছিল 'পাঁক' উপন্যাসে। সময়কাল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ। প্রেমেন্দ্রের বয়স তখন এগারো, আর যাতায়াতের পথটি ছিল ভবানীপুরের ৫৭, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিট থেকে সাউথ সুবার্বণ স্কুল। এই উপন্যাসে পথচলতি যে জীবন দেখেছিলেন প্রেমেন্দ্র, ক্রমে তাই হয়ে উঠবে তাঁর জীবনাদর্শ, ক্রমশ সময় ও সাহিত্য পরিবেশে তাই

হবে তাঁর সাহিত্যের প্রেরণা। কিন্তু এর আগে, বিশেষতঃ, ছোটগল্পে প্রেমেন্দ্রের আবির্ভাব মুহূর্তটি একবার দেখে নেওয়া যাক। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্র ও তাঁর তিন বন্ধু — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শিশিরচন্দ্র বসু ও বিনয় চক্রবর্তী 'আভ্যুদায়িক' নামে একটি সাহিত্যিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সভ্য ছিলেন সমবয়স্ক জনা দশেক লেখক। এই 'আভ্যুদায়িক সংঘ' প্রতিষ্ঠার ঠিক আগে সংঘের অন্যতম অনুপ্রেরণা ও ভবানীপুরের মেসবাড়ির বিমলচন্দ্র ঘোষ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রেমেন্দ্র তাঁকে দেশের বাড়ি ঢাকায় পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। এই যাত্রা তাঁরা করেছিলেন ষ্টিমার -এ। এই যাত্রা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, সেকথা প্রেমেন্দ্র লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথা 'নানা রঙে বোনা' গ্রন্থটিতে। সেবার ফেরার পর কয়েকমাস বাদেই ঢাকায় গেলেন প্রেমেন্দ্র । ইচ্ছে ছিল মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার। কিন্তু, সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অগ্রাধিকার দেওয়া হত বলে প্রেমেন্দ্র ভর্তি হয়ে গেলেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে। ঢাকায় শান্ত পরিবেশে পড়াশোনায় মনযোগ দিলেন প্রেমেন্দ্র। কিন্তু, কোলকাতার বন্ধুরা, বিশেষত 'আভ্যুদায়িক সংঘ' তাঁকে আকর্ষণ করত। ঢাকাতেও 'আভ্যুদায়িক সংঘ' এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করেন প্রেমেন্দ্র। মাঝে মাঝেই কোলকাতার জন্য মন উতলা হলে তিনি চলে আসতেন কোলকাতায়। এসে উঠতেন গোবিন্দ ঘোষাল লেনের পরিচিত সেই মেসে। এভাবে আসা যাওয়ার মাঝেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রেমেন্দ্রের কোলকাতায় আসা। ফাঁকা মেসের পুরোনো ঘরে হঠাৎ প্রেমেন্দ্র খুঁজে পান পূর্বের কোন বাসিন্দার নামে লেখা জীর্ণ একটি পোষ্টকার্ড। মেয়েলি গড়নে পারিবারিক সেই চিঠিতে অসুস্থতা ও অর্থাভাবের মধ্যবিত্ত জীবন উঠে এসেছিল। সেই চিঠি সহসা প্রেমেন্দ্রের কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, একথা প্রেমেন্দ্র নিজেই বলেছিলেন — 'কিছু যাদের নেই — যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের কোন গল্প কি হতে পারে না? হোক বা না হোক তাদের কথাই লিখব বলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম।' (গল্প লেখার গল্প - বেতার ভাষণ, ১৯৪৫) সেদিন রাতে এসে দুটি গল্প লিখে পরের দিনই গল্প দুটি প্রেমেন্দ্র পাঠিয়ে দিলেন তৎকালীন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা 'প্রবাসী'তে। এরপর প্রেমেন্দ্র ফিরে গেলেন ঢাকায়। দুটি গল্পই 'প্রবাসী' তে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হল। গল্পদুটির নাম যথাক্রমে 'শুধু কেরাণী' ও 'গোপনচারিনী' । 'প্রবাসী'র

মতো প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় জীবনের প্রথম গল্প প্রকাশিত হওয়ায় সাহিত্যিক জীবনের সূচনাতেই ছোটগল্পকার হিসেবে সমাদৃত ও প্রতিষ্ঠিত হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। শুধু তাই নয় নতুন কালের দৃষ্টিভঙ্গি কে স্বাগত জানিয়েছিল সমকালের অভিনবত্বের ধারক 'কল্লোল' পত্রিকা (প্রকাশ ১৯২৩, এপ্রিল) 'শুধু কেরাণী'র সপ্রশংস সমালোচনা করেছিলেন পত্রিকার সম্পাদক দীনেশচন্দ্র দাশ। এই স্বীকৃতির পর এবং বন্ধু অচিন্ত্যকুমারের উদ্যোগে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকেই প্রেমেন্দ্র হয়ে উঠলেন 'কল্লোল' পত্রিকা এবং 'কল্লোল গোষ্ঠী'র অন্যতম পুরোধা পুরুষ।

লেখক প্রেমেন্দ্রের উত্থানকাল এবং কল্লোল গোষ্ঠীর আবির্ভাব এ দুয়ের সঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সময় প্রভাব। আমরা মনে করতে পারি, প্রেমেন্দ্রের লেখক হিসাবে প্রথম আবির্ভাব 'পাঁক' উপন্যাস সূত্রে। উপন্যাসে যে বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত জীবনের কথা আছে, সেখানে স্পষ্টতঃই পীড়িত উপনিবেশিকতা ছাপ ফেলেছে। লক্ষ করার মত একটি নাম রয়েছে এ উপন্যাসে 'অশান্ত কর্মকার'; সাম্যবাদ, মার্কসতত্ত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গ উপন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে যুক্ত হলেও লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে এই অস্থিরমতি অশান্ত কর্মকারই নতুন রূপকার হয়ে উঠবে — এখানে প্রেমেন্দ্রের এই ভাবনা অনুভব করা যায়। লক্ষণীয় 'পাঁক' লেখা হচ্ছে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। স্বভাবতই দেশের এই পীড়ন সত্ত্বেও তাঁর মনে ভাববাদী একটি স্বপ্নাদর্শও ছিল। বস্তুত, প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা থেকেই রাজনৈতিক -সামাজিক নানা আলোড়নে আলোড়িত ছিল ভারতবর্ষ। এই প্রেক্ষাপটে যে কোন লেখকের মানসগঠনে পরিবেশের ভূমিকা খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রেমেন্দ্রের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী অস্থিরতা মননকেও প্রভাবিত করেছিল সমকালের লেখকদের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিত বিচার এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রেমেন্দ্র ছিলেন সদ্য কৈশোরপ্রাপ্ত; কিন্তু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর ভারতবর্ষ, রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভাব ফেলেছিল প্রেমেন্দ্রের মানসপটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় গড়ে দিয়েছিল তাঁর সময়ের অন্যান্যদের মত প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ। প্রেমেন্দ্র যে ব্যক্তিজীবনে অস্থিরচিত্ত ছিলেন তার একটা বড় কারণ তাঁর সময় তাঁকে প্রভাবিত করেছিল অত্যন্ত বেশী। প্রেমেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অচিন্ত্যকুমারের সাক্ষ্যে 'কল্লোল যুগ'

গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে প্রেমেন্দ্র প্রায় ভেসে পড়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ। প্রেমেন্দ্র তখন সদ্য যৌবন প্রাপ্ত। স্বদেশানুভূতি, দেশ চেতনার অনুভব তখন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এসময় প্রেমেন্দ্র গিয়েছিলেন বোলপুরের 'শ্রীনিকেতন'-এ কৃষিবিদ্যা শিখতে এবং অস্থির স্বভাববশত ফিরেও এসেছিলেন কলকাতায়। কিন্তু, সে বিচার স্বতন্ত্র। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সতেরো বছরে পা দেওয়া প্রেমেন্দ্রের পক্ষে মাটির জনগণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকূতিনিতান্তই আকস্মিক ছিল । তবে, এই সর্বজনজাতির প্রতি ঐকান্তিক অনুভূতিই পরবর্তীকালে 'প্রথমা' র (প্রকাশকাল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) কবি প্রেমেন্দ্রের মনে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। তরুণ প্রেমেন্দ্র আঠারো বছর বয়সে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন অন্যতম সুহৃদ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে সেগুলি অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগ' বইটিতে উদ্ধৃত করেছেন। চিঠিগুলিতে তরুণ প্রেমেন্দ্রের জীবনাদর্শ, অস্থিরতা, রোমান্টিকতা ভাবাবেগ ধরা পড়েছে। প্রেমেন্দ্রের লেখায় পাওয়া যাচ্ছে —

'দুঃখের তপস্যায় সবই অমৃত, পথেও অমৃত শেষেও অমৃত। সফল হও ভালই, না হও ভালই .....দুঃখের ভয়ে যারা কঠিন তপস্যা থেকে বিরত হয়ে সহজ পথ খোঁজে আরামের তাদের আরামই জোটে, আনন্দ নয়।' (পুরি থেকে লেখা চিঠি, সেপ্টেম্বর, ১৯২২, সূত্র ঃ কল্লোল যুগ)। এই অস্থিরতাময় জীবনবোধের সন্ধানের মাঝেই ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ছোটগল্পকার হিসেবে প্রেমেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। সমগ্র ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এ সময়টি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি আমেদাবাদে বয়ন শিল্পের মজদুরদের নিয়ে যে সংঘ গড়ে তুলেছিলেন তা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ট্রেড ইউনিয়ন -এ পরিণত হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি জনসাধারণকে অসহযোগ ও অহিংস সত্যাগ্রহের জন্য গড়ে তুলেছিলেন। এই সময়কেই অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বলেছেন 'নন কো অপারেশন -এর বানডাকা দিন' । কিন্তু অহিংসবাদের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনও বিশেষত বাংলাদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর প্রেক্ষিতে তৈরী হয়েছিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেসের চরমপন্থী ও আপোসপন্থী নেতৃবর্গের বিবাদে চরমপন্থী নেতারা 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' -এর ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে রাজদম্পতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং আপোসপন্থী

নেতাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এই বিরোধ চরমে ওঠে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চরমপন্থীরা বর্জন করেন কংগ্রেসী অধিবেশন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কিংসফোর্ড নিহত হলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গতিমুখ এরপর স্পষ্টতই পরিবর্তিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ধাবিত হয়েছিল। সমাজজীবনে এর ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। রাজনৈতিক মতবাদ তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব প্রভাব ফেলেছিল সাহিত্যে, তার প্রকাশ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) চার অধ্যায় (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) তারাশঙ্করের গণদেবতা (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ) পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি গ্রন্থে ।

এসময়ের বিপ্লববাদ এবং বিপ্লবদমন প্রচেষ্টা গভীর ছাপ ফেলেছিল বিশেষত বাংলাদেশের সমাজমনের গভীরে। সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে স্বদেশী বা বিপ্লবের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সমসাময়িক সাহিত্যকর্মে ছিল তারই স্বাক্ষর। এই শতকের সূচনায় বাংলাদেশে অভ্যাস ও সংস্কার বিরোধিতার সাহিত্যসাধনা শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই 'সবুজপত্র গোষ্ঠী' বিশেষত প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যসাধনায় এই বিরোধিতা মহিমান্বিত রূপ লাভ করেছিল। অন্যদিকে, শরৎচন্দ্র তাঁর সময়ে অন্যতম জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও সমাজ স্বীকরণে আবদ্ধ থেকে গিয়েছিলেন। স্বীকার্য যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিল। এসেছিল স্বাতন্ত্র্যের দাবি। বাস্তব ও আদর্শগতটানাপোড়েন সাহিত্যজগতকে নতুন নতুন বাঁকে এনে ফেলতে শুরু করেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত রূপান্তর ও নবজাগরণের পরে প্রাচ্য - পাশ্চাত্য ভাবসম্মিলন বাংলার সাহিত্য - দিগন্ত উন্মোচন করেছিল আগেই; আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা - সংস্কৃতির মতো জীবনসত্যকে আহরণ-অন্বেষণ শুরু হল প্রথম মহাযুদ্ধের পর ক্ষয়িষ্ণুতার সময়ে। এসময় বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক উন্নতির জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি সাম্প্রতিক আত্মার সংকটকে উদঘাটন করে, স্বপ্নবিলাসিতার ভিতরে উদ্বেগ উপস্থাপন এবং দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে নতুন জিজ্ঞাসায় ব্যক্তিস্বরূপের নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতার অনুধ্যান, - এই নতুন সাহিত্যপথের নিশানায় উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল 'কল্লোল গোষ্ঠী' ও তাঁদের অবদান মনীন্দ্রলাল বসু, গোকুল চন্দ্র নাগ, দীনেশচন্দ্র দাশ গঠিত 'ফোর আর্টস' ক্লাবের শিল্পচর্চার ফলে আত্মপ্রকাশ করেছিল 'কল্লোল' পত্রিকা (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ)। এই পত্রিকাই

ক্রমে হয়ে উঠেছে তরুণ লেখকদের মুখপাত্র। এরই নাম অনুসারে বাংলাসাহিত্যের একটা অধ্যায় চিহ্নিত হয়েছে 'কল্লোল যুগ' নামে। 'কল্লোল গোষ্ঠী'র সবচেয়ে বড় অবদান ছিল — এঁরা প্রতিভাবানদের আবির্ভাব-ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে রূপায়িত করার জন্য কল্লোলপন্থীরা যেমন সমাজের উপেক্ষিতদের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তেমনিই সমাজের বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্যই তাঁরা অতিমাত্রায় বাস্তব সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এই বাস্তব প্রবণতার একদিকে অসংকোচ যৌনতা, অন্যদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের অভাব অভিযোগ জনিত দুঃখবোধের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই এই ভিন্নধারার সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত হয়েছিল। এই অতি আধুনিক বাস্তবতাকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন, বিদ্রুপ করে বলেছিলেন 'রিয়ালিটির কারি পাউডার' ('সাহিত্য' প্রবন্ধ প্রসঙ্গত লক্ষণীয়) অবশ্য 'কল্লোল যুগ' এ অচিন্ত্য কুমার লিখেছেন যে অতি আধুনিক সাহিত্য বিষয়কে কেন্দ্র করে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রভবনে সভা বসেছিল, এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যই পরে ছাপা হয়েছিল 'সাহিত্যের ধর্ম' নামে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে স্বীকার করেছিলেন (সূত্র ঃ কল্লোল যুগ পৃঃ ১৮৬)। অন্যদিকে, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে এও বলেছেন, 'কল্লোলের সে যুগটাই ছিল সাহসের যুগ এবং সে সাহসে রোমান্টিমিজমের মোহ মাখানো'। (কল্লোল যুগ, পৃঃ ৪৭) এই রোমান্টিক বাস্তবচেতনা কল্লোলীয় গোষ্ঠীর সাহিত্যে বোহেমীয় , ভবঘুরে বেপরোয়া রূপ নিয়েছে। তাই কল্লোলপন্থীদের জীবনবোধের মধ্যে একটা স্বপ্নাবেশ লক্ষ করা যায়। জীর্ণ সংস্কারকে ভেঙে দেবার সংকল্প ছিল তাঁদের এবং দৃষ্টিতে ছিল যাযাবর জীবনের ধূসরতা। আবার একথাও সত্যি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর লেখকদের রচনায় যে সংশয়, অবিশ্বাস, হতাশার সুর বেজেছে, যা কল্লোলীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সমাজ চিন্তায় ধরা পড়লেও অনেক ক্ষেত্রেই এই সুর ছিল অস্পষ্ট। সমালোচক ড. সুরজিৎ দাশগুপ্ত এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, 'প্রথম মহাযুদ্ধের বিপর্যয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার থেকে আশুচেতন শিল্পীদের বঞ্চিত করেছিল, পিতৃ পিতামহদের বিশ্বাসের আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল; কিন্তু, এই মর্মান্তিক সত্যকে যথাযথ ও পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করা তৎকালীন বঙ্গবাসীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মানসিক রিক্ততার এক অস্পষ্ট অনুভূতিতে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে অভ্যস্ত জীবনবোধের থেকে অজানা সত্যের সন্ধানে পথে

বের হয়েছিলেন এবং প্রত্যেক পদে দিক ঠিক করতে না পাবার ব্যর্থতায় জর্জরিত হয়েছিলেন ...।' (পৃ ৬০; বাংলা ছোটগল্পের সূচনা ও প্রেমেন্দ্র মিত্র/ সুরজিৎ দাশগুপ্ত)। সুরজিৎ দাশগুপ্তের প্রায় সমর্থন করেই বলা যায়, পূর্ববর্তী সংস্কারে 'বিরুদ্ধবাদ' এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কথিত 'ভাববিলাস' এ দু'য়ের মাঝে দিক সন্ধানে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিলেন কল্লোলীয়রা; তবে এ আন্দোলন ব্যর্থতায় জর্জরিত হয়েও প্রতিভাবান লেখক গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল। তাই 'কল্লোল' পত্রিকা স্বল্পায়ু (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে অবলুপ্ত) হলেও এর প্রভাব এবং সৃষ্ট লেখককুল সাহিত্যে দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করেছিল। তাছাড়া তৎকালীন বাংলার সমাজজীবন এবং সমাজচিন্তার বিবর্তনে কল্লোলীয়দের প্রভাব তাঁদের সমকালে অনস্বীকার্যই ছিল। কল্লোল সমকালে কৌলিন্য প্রথার ভয়াবহতা স্তিমিত হয়েছিল। কিন্তু রয়ে গিয়েছিল বিধবা বিবাহের মত জটিল সমস্যা । তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতা। এইসব সমস্যাকেই উপস্থাপিত করেছেন কল্লোলীয়রা; সমাধানের রাস্তা তাঁরা দেখাননি। সামাজিক সমস্যার রূপায়ণে এখানেই প্রাক-কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের সঙ্গে কল্লোলীয়দের পার্থক্য। এঁদের পথিকৃৎ মনীন্দ্রলাল বসু, গোকুল নাগ এবং সর্বোপরি কাজী নজরুল ইসলাম। মনীন্দ্রলাল বসুর লেখা 'অরুণ' (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাস - এর সার্থক দৃষ্টান্ত । অরুণ এবং বীণা পরস্পরকে ভালোবাসত, কিন্তু বীণা বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলে অরুণ রোমান্টিক অতৃপ্তিতে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর কারণ কিংবা সদুত্তর তার নিজের কাছেও ছিল না। এরপর রাশিয়ার বিপ্লব প্রত্যক্ষ করে গ্রীনল্যান্ড,কানাডা হয়ে আমেরিকায় যখন পৌঁছল অরুণ, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোড় চলেছে। রেডক্রশে যোগ দিল সে এবং তার মৃত্যু হল যুদ্ধক্ষেত্রে নামহীন, পরিচয়হীন হিসেবে। আর কোন এক কৃতী আইনজীবীর স্ত্রী বীণার হাতে পৌঁছল সামরিক বিভাগের ছাপ মারা মোড়ক। মনীন্দ্রলাল বসুর 'অরুণ' উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যে নতুন 'অরুনোদয়' বলে মন্তব্য করেছেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত। বাংলা সাহিত্যের দিক-পরিবর্তনে এভাবেই জড়িয়ে গেছে 'কল্লোল' এর নাম। প্রসঙ্গত 'কল্লোল' পত্রিকা দিয়েই এই ভিন্ন-চেতনার জাগ্রত সচেতনতার যাত্রা শুরু হলেও 'কল্লোল গোষ্ঠী' বলতে 'কল্লোল' (১৯২৩ খ্রিঃ), 'কালিকলম' (১৯২৬ খ্রিঃ), 'প্রগতি' (১৯২৭ খ্রিঃ), 'ধূপছায়া' (১৯২৭ খ্রিঃ) প্রভৃতির লেখককুলকেই বোঝানো হয়। এর পাশাপাশি

জাতীয় চেতনার বাহক অর্ধসাপ্তাহিক 'ধুমকেতু' ( ১৯২২ খ্রিঃ) এবং 'সংহতি' (১৯২৩ খ্রিঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। এর ফলে তারুণ্যের অস্থিরতা, আকাঙ্খা যন্ত্রণা, স্বপ্ন ব্যক্ত হয়েছিল এই সময়ের লেখকদের দ্বারা; মণীন্দ্রলালের 'অরুণ' সেই সময়ের অগ্রপথিক অন্যদিকে মূল্যবোধের পরিবর্তন , শ্রেণীবৈষম্য এ সময়ের লেখায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমস্ত বিশ্বে দুই তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল প্রথমটি হল রুশ বিপ্লব চেতনা (১৯১৭ খ্রিঃ) এবং দ্বিতীয়টি হল মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সূচনা করেছিলেন মার্কস অনেক আগেই 'দ্যাস ক্যাপিটালের' মধ্য দিয়ে। এই সমাজতন্ত্রবাদ মূলত যে ক'টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েছিল তার অন্যতম একটি হল দ্বান্দ্বিক জড়বাদ বা বস্তুবাদ। মার্কসের মতে বিশ্বজগৎ ও মানবসমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন আসে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। থিসিস, অ্যান্টিথিসিস ও সিন্থেসিস এই তিনটি শক্তি পরিবর্তনের কারণ; বিশ্বজগৎ ও মানবসমাজের দ্বন্দ্ব চিরকালীন। কোন সমাজব্যবস্থাই স্থায়ী নয়, যতক্ষণ তার মধ্যে স্ববিরোধিতা থাকছে। বর্তমান সমাজে পুঁজিবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমন্বয়কারী শক্তি হল 'শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা'। মার্কসের এই মূল্যায়ন জীবন সম্পর্কে বিশ্লেষণী ব্যাখ্যাদানে সক্ষম হয়েছিল। ফলে, অভিনব সমাজচিন্তায় নব্যতরুণদের পথিকৃৎ ছিল মার্কসীয় দর্শন। আর রুশ বিপ্লবের ফল নির্যাতিত মানুষের মনে, বিশেষত শ্রমজীবি মানুষের মনে জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার মন্ত্র দিয়ে হাজির হয়েছিল। এর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর কাল নতুন আশা ও আশ্বাস প্রদান করেছিল সাধারণ মানুষকে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে অর্থনৈতিক সংকট সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করেছিল।

১৯২৯- ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয় শুরু হয়। আমেরিকার শেয়ার বাজারের বিপর্যয়ের ফলে উদ্ভূত বাণিজ্যিক সংকট অর্থনৈতিক জীবনে চরম সর্বনাশের আশঙ্কা বয়ে আনে। ইংল্যান্ড Gold Standard বর্জন করতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিক কারণে, ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতেও এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ঢেউ এসে পড়ে। ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য বিপর্যস্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে গোটা পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সংকটের মুখে কমিউনিজম, সোসালিজম -এর বাণী, শ্রমিক সংঘ গঠন ইত্যাদি অর্থনৈতিক - মানসিকভাবে বিপর্যস্ত জনসাধারণের

মনে এক প্রবল আশ্বাসের জোয়ার এনেছিল। মনীন্দ্রলাল বসুর 'হলায়ুধের ডায়রি'তে হলায়ুধ বলেছিল যে ভাঙনের দুর্দিনে জন্মেছে বলে দুঃখ নয়, নতুন উত্থানের আনন্দই তাদের সঙ্গী। কিন্তু, এই আশাবাদ ব্যর্থ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর ; সময় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ। এই সময় যুগচেতনা এবং সাহিত্যের সার্থক উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দেই 'শুধু কেরাণী' তে এসেছে সময়ের প্রভাব—সামান্য বেতনের কেরাণীকুল, আর্থিক অনটনে মানুষের বিধ্বস্ততা - প্রভৃতি সূচনাতেই উল্লেখিত হয়েছে। যুগকালীন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, পূর্বজদের স্বীকৃতি এবং তাদের প্রভাবমুক্তি প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্প আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর 'ভাঙন ও বিপর্যয়ের মধ্যে' তাঁর সমকালের অন্যান্যদের মতো প্রেমেন্দ্র-প্রতিভা বর্ধিত হয়েছিল। স্বভাবতই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস ধরা পড়েছে তাঁর সাহিত্যে। এই ইতিহাস সামাজিক ও রাজনৈতিক। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে, প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পগুলিও আঙ্গিক ও চরিত্রগত দিক দিয়ে ক্রমিক বদলে গেছে। এবং এ পরিবর্তন সময় নিরিখে খুব স্বাভাবিক ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়কালে প্রেমেন্দ্র সদ্য কৈশোর প্রাপ্ত ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর বেড়ে ওঠা। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আকস্মিকভাবে শেষ হয়েও যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক বিক্ষোভ - আন্দোলন প্রভাবিত করেছিল প্রেমেন্দ্রকে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের পর প্রেমেন্দ্র যখন একের পর এক ছোটগল্প লিখবেন, তার আগে দীর্ঘ চিঠিতে বন্ধু অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লিখছেন — 'মানুষের দিকে তাকিয়ে আজকাল কি দেখতে পাই জানিস ? সেই আদিম পাশব ক্ষুধা-হিংসা, বিষ আর স্বার্থপরতা। চোখের বাতায়ন দিয়ে শুধু দেখতে পাই সুসভ্য মানুষের অন্তরে আদিম পশু ওৎ পেতে আছে। যে চোখ দিয়ে মানুষের মাঝে দেবতাকে দেখতুম সেটা আজ অন্তপ্রায়'। (পৃঃ ১৩, কল্লোল যুগ /অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)।

একই চিঠিতে প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন গলস্ওয়ার্দির রচনার কথা; লিখেছিলেন অপ্রকাশ্য ব্যাকুলতার কথা। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকট, এবং 'কল্লোলীয়' ভাবাবেগ এখানে বিদ্যমান ছিলই । আবার ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে 'কালিকলম' পত্রিকা প্রকাশের সময় প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন যে 'আর্ট' তার কাছে 'প্রিয়ার' চেয়েও বড়। রুশ বিপ্লবের প্রভাব সাহিত্যজগতে একটি দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিল, ক্রমে

সাহিত্যিকরা খুঁজে পাচ্ছিলেন আত্মস্থ হওয়ার পথ। প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যসাধনায় তাঁর উক্তিটি এর সূচক। যুদ্ধোত্তর বাস্তবতা, সাম্যবাদও এসময় প্রভাব বিস্তার করেছিল। তত্ত্ব এবং সংরূপগত আলোচনা, প্রতি আলোচনা, সমালোচনায় বাংলা সাহিত্য যে লাভবান হয়েছিল, সেকথা উল্লেখ করেছেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' বইটিতে। প্রগতিপন্থী লেখকবৃন্দের মধ্যে সাম্যবাদী ধারণার প্রসার করেছিল সম সাময়িক পত্রিকাগুলি। 'সংহতি', 'বঙ্গবাণী', 'লাঙল', 'প্রগতি', 'অরণি' প্রভৃতি পত্রিকার নাম স্বভাবতই উঠে আসে এই সূত্রে। 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন ও সাহিত্য' - ১ম অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি — প্রেমেন্দ্র সমকালের প্রগতিবাদী আলোড়নে, পত্রিকা গোষ্ঠী সম্পাদনা-কর্মে কিভাবে জড়িয়ে ছিলেন; আবার সংরূপগত আলোচনায় বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন 'কবিতা' পত্রিকা (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ), যাতে বিদেশী সাহিত্যের প্রেরণা গ্রহণ করেও অন্ধ অনুকরণের অস্বীকৃতিও জানিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র। সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রেমেন্দ্রের প্রথম কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ — 'প্রথমা'। প্রেমেন্দ্র ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব ঘটে গিয়েছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। ভারতের প্রগতি-মনস্ক প্রায় সকল লেখকই এর সদস্য ছিলেন। প্রগতি লেখক সংঘ -র সদস্যরাই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন দ্বিভাষিক 'প্রগতি' এবং 'টুওয়ার্ডস প্রগ্রেসিভ' — এখানে স্থান পেয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কল্পনায়' নামে একটি ছোটগল্প। ছোটগল্পের বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছিল নির্যাতন, এক্সপ্লয়েটেশন, হতাশা, বিভ্রান্তি এবং চরিত্র হিসাবে এ গল্পে এসেছিল জাহাজের শ্রমিক মালেক। মালেকের আত্মহত্যাকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এই আত্মহত্যা বঞ্চনার প্রতিবাদস্বরূপ ছিল, যার মূল প্রোথিত ছিল সমাজতন্ত্রবাদের গভীরে। 'সংহতি' পত্রিকায় সচেতন সমাজতন্ত্রমুখী অন্বেষণের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। এছাড়া কাজী নজরুলের সাম্যবাদী আদর্শও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। নজরুলের 'কৃষাণের গান', শ্রমিকের গান, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগীতের অনুবাদ প্রভাবিত করেছিল অনুজ কবিদের। নজরুলের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও তার 'কল্লোল যুগ' -এ — 'নজরুল 'বিষের বাঁশি' বাজাচ্ছে আর সে সুর-সে কথা সবাইকার রক্তে বিদ্রোহের দাহ

সঞ্চার করছে'। (পৃঃ ৩২, ঐ) মানবসভ্যতা, উপনিবেশিকতাবাদ, পুঁজিবাদী শোষণ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ইত্যাদি বীক্ষণ ছায়া ফেলেছিল প্রেমেন্দ্রের সমকালের সাহিত্যে; ছোটগল্পেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। প্রসঙ্গত, প্রেমেন্দ্রের বিভিন্ন ছোটগল্প যেমন- 'মৃত্তিকা', 'ছুটি', 'মহানগর', 'অফুরন্ত' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। অর্থাৎ কল্লোলীয় রোমান্টিক 'ভাববিলাস' এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব প্রেমেন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে এবং সন্দেহ নেই এরই মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্যিক হিসেবে পথ তৈরী করেছেন। নিজস্বতায় অনন্য হয়ে উঠেছেন প্রেমেন্দ্র ।

কিন্তু, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হঠাৎ ঘোষণায় পরিবর্তিত হল পরিস্থিতি। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সেদিনই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করে। এর সম্পর্কে জনমতের কোন মূল্যবোধের মর্যাদা না দিয়েই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট স্বল্প সময়ের সিদ্ধান্তে আইন পাশ করে বড়লাটকে একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্পণ করে। এই সঙ্গে ভারত রক্ষা আইন জারি করা হয় এবং আইনের বলে সরকারের হাতে স্বেচ্ছাচারিতার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আসে, যার দ্বারা বিশ্ব ওয়ারেন্ট গ্রেফতারি থেকে শুরু করে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত অর্পিত হয় এই ক্ষমতায়। ভারতের শ্রমজীবি মানুষ এই অন্যায় অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় নি। যেদিন যুদ্ধ ঘোষিত হল সেদিনই মাদ্রাজে এক বিরাট সংখ্যক জনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল মিছিল করে। বোম্বের ৪০টি কারখানায় ৯০ হাজার শ্রমিক যুদ্ধের প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করে। রাজনৈতিক সচেতনতা ক্রমশ যে সার্বিক হয়ে উঠেছিল, এটি তার প্রমাণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও অর্থনৈতিক সংকট তৈরী হয়েছিল। এসেছিল সামাজিক রাজনৈতিক নানা আলোড়ন, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মত তা সর্বব্যাপ্ত হয়ে ওঠেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত রাজনৈতিক মতাদর্শগত আলোড়ন সৃষ্টি করলেও আন্দোলন সর্বব্যাপ্ত হয়নি এবং আন্দোলনের গতিমুখ নির্দ্দিষ্টও হয়নি। সেখান থেকে দেখলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব সাধারণ জনজীবনে অনেক বেশী এবং এর ফলও অনেক সুদূর প্রসারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক সমস্যার রূপ নিয়েছিল। যুদ্ধের বিপক্ষে গান্ধীজির 'ভারতছাড়ো' আন্দোলন (১৯৪২) সমস্ত ভারতবর্ষের সচেতন মানুষকে একত্রিত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে শরিক করেছিল। কিন্তু ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের

মেদিনীপুর সাইক্লোন - কবলিত হল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রবল শস্যহানি, অন্যদিকে যুদ্ধের জন্য প্রচুর রসদ সংগ্রহের ফলে খাদ্যাভাব দেখা দিল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রায় সমগ্র ভারত দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের অনেকটাই ছিল মনুষ্যসৃষ্ট ও কৃত্রিম। বাংলাদেশে এই দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বলে খ্যাত। এই মন্বন্তরের সবচেয়ে প্রকট প্রকাশ দেখা যায় বাংলাদেশে। বাংলার গ্রামে -শহরে, মহানগরী কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। গ্রামের হাজার হাজার মানুষ শহরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল দুটি খাদ্যের আশায় একেবারে মিছিল করে। গ্রামের বিত্তবানরা আরও মুনাফা লাভের আশায় খাদ্য মজুত করে রাখতে লাগলেন। আর এর সঙ্গে হাত মেলাল শহরের ধনী শ্রেণী; শহরের সাধারণ কলকারখানার মালিক পর্যন্ত যুদ্ধের দৌলতে কালোবাজারীর মাধ্যমে একেবারে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। সৃষ্টি হল নতুন পুঁজিপতি সমাজের। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় এদের চক্রে ঘুরতে লাগল। গ্রাম সমাজের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে এই জোতদার সম্প্রদায় সৃষ্টি করল মুষ্টিমেয় বিত্তবান এবং অসংখ্য বিত্তহীন দরিদ্র সম্প্রদায়। এই বিত্তবানেরাই শোষণ করতে লাগল মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীকে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দেই দামোদরের বন্যায় প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হল এবং সরকারের 'র‍্যাশনিং প্রথা' প্রবর্তন হল এবং ক্রমে সেখানেও দুর্নীতি দেখা দিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ক্রমে সংক্রমিত হল বিহার, ঢাকা, নোয়াখালিতে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগষ্ট মাসে দেশে স্বাধীনতা এল রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব ও ভ্রাতৃহত্যার মধ্য দিয়ে । ভারতভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ল। সৃষ্টি হল উদ্বাস্তু সমস্যা। আর এক শ্রেণীর মানুষের দ্বারা শোষিত হতে লাগল তারা। রাজনৈতিক দুর্বলতার ও সামাজিক অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে এই সুবিধাভোগী শ্রেণী জনসাধারণের ওপর তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ শুরু করেছিল প্রশাসনের সাহায্যে । এই সময় বাংলায় উদ্ভব হয় ব্ল্যাকমার্কেট' বা কালোবাজারির। এই ব্ল্যাক মার্কেটও যুদ্ধেরই অভিশাপ। সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষ বিচিত্র উপায়ে অসৎপথে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতিও করেছিল এ সময়েই। সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশ এই দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় সম্পদ ঐশ্বর্যে অসম্ভব সাফল্য লাভ করল। ফলে সম্পদ ও ঐশ্বর্যে তাঁরা সামাজিক প্রতিষ্ঠার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করল। এঁরা সমস্ত প্রকার নৈতিক ভারসাম্য হারিয়ে

ফেলল। জীবনের অন্ধকারময় পথে হাঁটতেও দ্বিধা করল না। যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারল না নৈতিক কারণে অথবা অযোগ্যতার জন্য —তারা ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হতে লাগল এবং দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম অবস্থায় নেমে যেতে লাগল। পাপাচার, গণিকাসম্ভোগ মাত্রাছাড়া হয়ে পড়ল। সর্বোপরি, শোষণ ইত্যাদি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন প্রবাহকে নতুন খাতে বইয়ে দিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্রসীমার নীচে নেমে গেল। শিক্ষার প্রতি আগ্রহে, চাকরির আশায়, গ্রামবাসী শহরমুখী হতে লাগল এবং কদর্য জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকল। এই অবিশ্বাস, হতাশা, যৌনবিকৃতি এসময়ের সাহিত্যে রূপ পেয়েছে ফ্রয়েড়ীয় চিন্তা ও মার্কসীয় দর্শনও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। আবার, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মাঝামাঝি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, শিক্ষক ধর্মঘট, খাদ্য আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাষট্টি-তেষট্টিতে চীন ভারত সীমান্ত-সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কমিউনিষ্ট শিবিরে ভাঙ্গন, উগ্র জাতীয়তাবাদের পূর্ণপ্রকাশ একটা দ্বন্দ্ব তৈরী করল সাহিত্য-জমিতেও। এর পরের ইতিহাস কৃষক আন্দোলন, বিপ্লববাদী নানা স্তর পর্যায়ের ইতিহাস।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ও ফলাফল আলোচনা করলেই বোঝা যায় দুটি বিশ্বযুদ্ধে সাহিত্যগত প্রভাব দুই চরিত্রের ছিল। অর্থাৎ, দুটি বিশ্বযুদ্ধ অর্ন্তবর্তী ও পরবর্তী সময়ে যাঁরা লিখছেন তাঁদের লেখাতেও সমকালের প্রেক্ষিত বদল স্বাভাবিক। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক্ষেত্রেও এই দুটি যুদ্ধই প্রভাব বিস্তার করবে সেটাই স্বাভাবিক। স্বভাবতই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যখন লিখছেন প্রেমেন্দ্র তার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের লেখার পার্থক্য তৈরী হয়েই যাচ্ছে। এই পার্থক্য কোথাও স্পষ্ট, কোথাও সূক্ষ্ম। রুশ বিপ্লবের অভিঘাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব সাহিত্যে তার পটভূমি প্রভাবিত হয়েছে। রোমান্টিক আশাবাদ, একদিকে স্বদেশী আন্দোলন অন্যদিকে সাম্যবাদী চিন্তার প্রভাবের ফলে সাহিত্য জগতে যে আলোড়ন এসেছিল তা স্থায়ী হয়েছিল তিরিশের দশক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব সময় পর্যন্ত। একারণেই প্রেমেন্দ্রের 'শুধু কেরাণী' 'সাগরসংগমে', 'পুন্নাম', 'ভবিষ্যতের ভার', 'মোট বারো', 'কেশবানন্দের তিরোধান', প্রভৃতি অসংখ্য গল্পে সমসময়, নৈতিক চেতনা-মূল্যবোধ, সাম্যবাদী মনোভাব ও ঐক্যের কথা উঠে আসতে দেখি। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী প্রেমেন্দ্র

মিত্রের উল্লেখযোগ্য গল্প — 'চুরি','হারানো মেয়ে', 'সামনে চড়াই', 'পান্থশালা', 'গল্পে নেই' প্রভৃতি গল্পে দেখা যাচ্ছে নৈতিক মূলবোধহীনতা, সামাজিক অবক্ষয়, দ্বন্দ্ব, হতাশারছবি, অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্রের সামগ্রিক ছোটগল্পে দুটি পর্ব স্বাভাবিকভাবেই বিন্যস্ত হয়েই গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্তর্বর্তী সময়ে প্রেমেন্দ্র যে গল্পগুলি লিখেছেন তার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের গল্পগুলির সময়গত ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক।

প্রথম পর্বে মানবিক চেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছিল প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যে। প্রসঙ্গত, 'সাগর সংগমে', 'কল্পনায়', 'কেশবানন্দের তিরোধান', 'মোট বারো' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। ক্রমে মানবিকতা বোধের যে পরিচয় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিবেকহীন, স্বার্থান্ধ মানুষের পরিচয় আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাঁর — 'মেয়েটি', 'বিপরীত', 'দর্পণ', 'সখীর দলের মেয়ে' প্রভৃতি গল্পে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে লেখা।

তাছাড়া রোমান্টিকতাও নানাভাবে বদলে গেছে প্রেক্ষিত অনুসারে। রোমান্টিক গল্প প্রসঙ্গে বলতে হয়, প্রথমদিকের গল্পে প্রেমেন্দ্র সর্বদাই উপস্থাপিত করেছেন নৈতিক দ্বন্দ্ব, যেমন — 'এই দ্বন্দ্ব' 'দিবা স্বপ্ন' , 'হয়তো', 'কুয়াশা' প্রভৃতি ; এছাড়াও আছে মিলনাভূতি ও পরিবেশের বৈপরীত্য যেমন — 'ভিড়', 'লাল-তারিখ', 'অরণ্যস্বপ্ন', 'যাত্রাপথ', 'পলাতকা' প্রভৃতি। কিন্তু, দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলি ক্রমশ বিষয় ও ভাবনায় জটিলতর হয়ে উঠেছে । দুটি বিশ্বযুদ্ধই প্রেমেন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে, দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও তার ফল প্রত্যক্ষ করেছেন প্রেমেন্দ্র। স্বভাবতই প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যিক হিসাবে অবস্থিতির দীর্ঘ সময়কে কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে বেঁধে রাখা যাবে না। কিন্তু দুটি বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রান্ত সময় কিভাবে ও কতখানি প্রেমেন্দ্রকে ও তাঁর সাহিত্যকে প্রভাবিত করল সে বিষয়ে আলোচনায় প্রেমেন্দ্রর সামগ্রিক ছোটগল্পের প্রেক্ষিতে আমরা তাঁর ছোটগল্পকে দুটি পর্বে ভাগ করতে পারি —

১। প্রথমত, প্রাক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের বিষয় পর্যালোচনা

২। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পর্বে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের বিষয় আলোচনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল সমকালের ও পরবর্তী বঙ্গসমাজ ও বাঙালী মননকে তাও আমরা উল্লেখ করেছি, তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

উঠেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালেই অবশ্য সাহিত্যিক হিসাবে প্রেমেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ (সময়কাল ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দকে যদি প্রেমেন্দ্রের আবির্ভাব সময় ধরে নেওয়া হয় তাহলে পরবর্তী পনের বছর প্রেমেন্দ্রর সাহিত্য জীবনের বিকাশ ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়কালে প্রেমেন্দ্রর বয়স মাত্র এগারো। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ প্রেমেন্দ্রের জন্মসময় ধরে নিলে, কৈশোরে উন্মাদনা সত্ত্বেও তাঁর মানসগঠনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ততখানি কার্যকরী হওয়ার কথা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখানে গুরুত্ব পেয়েছে সেই মানসগঠন ও পরিণতির কারণ হিসেবে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই প্রেমেন্দ্রের প্রকাশিত গল্পসংকলনের সংখ্যা নয়টি এবং গল্পসংখ্যা অন্তত সত্তরটি এবং এসময়ে 'প্রথমার' কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা নয়টি। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব প্রেক্ষিত অনেকাংশেই তৈরী করেছে প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যরচনার পটভূমি। আবার দীর্ঘজীবী প্রেমেন্দ্রের (মৃত্যু ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ) সাহিত্যসম্ভার বিশেষত ছোটগল্পের সংখ্যা বিপুল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিও স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ — যতদিন মৌলিক ছোটগল্প লিখেছেন প্রেমেন্দ্র — সেই দীর্ঘ সময়ের আলোচনাও তাই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় পর্বে প্রেমেন্দ্রের গল্পসংকলন সংখ্যা আঠারো এবং গল্পসংখ্যা অন্তত একশো। এই পর্বকে আমরা প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যজীবনের পরিণতির পর্ব বলে গ্রহণ করতে পারি।

লক্ষণীয় যে, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের পরে প্রেমেন্দ্রের নতুন মৌলিক ছোটগল্প পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে প্রেমেন্দ্র- লিখিত গল্পগুলির সন তারিখের হিসেব করা কঠিন। অথচ গল্পসময় জানা একজন গল্পলেখককে বিশ্লেষণ ও গল্পগুলির মূল্যায়নের জন্য খুবই জরুরী হয়ে ওঠে। কিন্তু, প্রেমেন্দ্রের স্বভাবধর্মে অগোছালো মানসিকতা প্রশ্রয় পেয়েছে বলে গল্পগুলির সন তারিখ গল্পগুলি থেকে সবসময় জানা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয় গল্প সংকলন গুলির প্রকাশের উপর, কিন্তু এক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পসংকলন গুলির ক্রমপঞ্জির সাহায্যে গল্পগুলির সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পরেও অবশ্য গল্পগুলির শ্রেণীগত বিভাজন ও আলোচনা প্রসঙ্গিক হয়ে ওঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প

আলোচনার জন্য আমরা প্রধানত গ্রহণ করেছি 'ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রকাশনা' সংস্থা কর্তৃক ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প' -এর তিনটি খন্ড। এছাড়া গল্প সংকলন হিসেবে প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ে প্রকাশিত সংকলনগুলি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে গল্পসংকলনগুলিতে সন্নিবেশিত গল্পগুলিকে আমরা নির্দিষ্ট করেছি আলোচনার জন্য । প্রথম পর্বে অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রিঃ থেকে ১৯৩৯ খ্রিঃ -এর মধ্যে সংকলনগুলি হল — 'পঞ্চশর', 'বেনামী বন্দর', 'পুতুল ও প্রতিমা', 'মৃত্তিকা', 'অফুরন্ত', 'মহানগর', 'নিশীথ নগরী' ও 'ধূলিধূসর'। ১৯৪৬ খ্রিঃ থেকে ১৯৭৭ খ্রিঃ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংকলনগুলি হল — 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে', 'সামনে চড়াই', 'সপ্তপদী', 'জলপায়রা', 'ক্বচিৎ কখনো', 'শ্রাবণে ফাল্গুনে', 'হাতে হাত রাখো', 'অষ্টপ্রহর' প্রভৃতি। এছাড়াও আছে স্বনির্বাচিত ও শ্রেষ্ঠ গল্পসংকলনগুলি। এই সবগুলি সংকলনের গল্পই সময় নিরিখে 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প' -এর খন্ডগুলিতে ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত হয়েছে।

প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কালে প্রেমেন্দ্রের মানসবৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে আমরা তাঁর এ পর্বের গল্পগুলির শ্রেণীকরণও করতে পারি , যেমন —

* দাম্পত্য জীবন ভিত্তিক গল্প — 'শুধু কেরাণী', 'শুরু ও শৃঙ্খল', 'এই দ্বন্দ্ব', 'থার্মোফ্লাক্স ও চীনের যুদ্ধ', 'যাত্রাপথ' প্রভৃতি।

* রোমান্টিক গল্প — 'পঞ্চশর' গল্পসংকলন এর অন্তর্ভুক্ত আটটি গল্প, 'অরণ্য স্বপ্ন', 'ভস্মশেষ', 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনি', 'শরতের প্রথম কুয়াশা' প্রভৃতি।

* সামাজিক ভাবে অবহেলিত মানুষের গল্প — 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'কল্পনায়', 'সংক্রান্তি', 'লজ্জা', 'মোট বারো', 'সংসার সীমান্তে' প্রভৃতি।

* সামাজিক পটপরিবর্তনসূচক গল্প — 'মৃত্তিকা', 'সিদ্ধকল্প', 'পূর্ণমিলন', 'অফুরন্ত' প্রভৃতি।

* মনস্তাত্ত্বিক গল্প — 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'জীবন যৌবন', 'অরণ্যপথ' , 'সত্য-মিথ্যা', 'হয়ত' প্রভৃতি।

* সামাজিক মূল্যবোধ ও নীতিবাচক গল্প — 'দিবা-স্বপ্ন' , 'সাগরসঙ্গমে', 'কুয়াশা', 'অনাবশ্যক' 'মহানগর' , 'কেশবানন্দের তিরোধান' প্রভৃতি ।

— দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলিকেও স্বাভাবিক ভাবেই কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীকরণে চিহ্নিত করা যেতে পারে —

১। রাজনৈতিক চেতনামূলক গল্প — 'গল্পে নেই', 'সামনে চড়াই', 'পাহাড়', 'চির দিনের ইতিহাস', 'ভিজে বারুদ', 'ময়ূরাক্ষী', 'যখন বাতাসে নেশা' ইত্যাদি।

২। সামাজিক পরিবর্তনের গল্প — 'আয়না', 'ম্যাজিক', 'দর্পণ', 'সখীর দলের মেয়ে', 'পিস্তল' প্রভৃতি।

৩। অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যবোধহীনতার গল্প — 'জ্বর', 'চুরি', 'হারানো মেয়ে', 'মেয়েটি', 'বিধাতা' ইত্যাদি।

৪। রোমান্টিক গল্প — 'অলভ্যা', 'মৃদুলা', 'ছেদ', 'কচিৎ কখনো', 'হাতে হাত রাখো', 'রোদ', 'বৃষ্টি' ইত্যাদি।

৫। প্রতীকী গল্প — 'বাঘ', 'সাপ', 'ষষ্টিরূপে', 'তমোনাশ', 'দর্পন', 'লেভেল ক্রসিং' প্রভৃতি।

৬। মনস্তাত্ত্বিক গল্প — 'মন্দির', 'দেয়াল', 'ছেদ', 'ছায়াকায়া', 'অসমাপিকা', 'কলকাতার আরব্য রজনী' প্রভৃতি।

৭। হাস্যরসাত্মক গল্প — 'আদ্যক্ষর', 'বিপদমানেই বিপদবারণ', 'সভাপতি খুঁজতে নেই', 'পরোপকার', 'ট্রাঙ্ককল' প্রভৃতি।

৮। চিত্রনাট্যের আদলে লেখা গল্প — 'ইকেবানা', 'ঘটনাসামান্য' ইত্যাদি।

৯। দাম্পত্যজীবন ভিত্তিক গল্প — 'মল্লিকা', 'কালো জল', 'ষ্টোভ', 'যুথিকা' প্রভৃতি।

— আলোচ্য এ দুটি পর্বের গল্পগুলির শ্রেণীকরণের ভিত্তিতে বিষয়ভাবনার বিশ্লেষণ ও বিষয়ের যথাযথ পরিস্ফুটনে যে শিল্পস্বরূপ গড়ে উঠেছে তার বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করা হবে।